বেলা অবেলার কথা

ধান বৈচিত্র্য ধরে রাখার উপায়

ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

ধানই পৃথিবীতে বোধহয় একমাত্র ফসল যা বিচিত্র পরিবেশে অভিযোজনে সক্ষম। জাপানের হোক্কাইয়োদোর হিমশীতল পরিবেশ থেকে বিষুব রেখার আশপাশের উষ্ণ এবং অউষ্ণ এলাকা; সাগর-সমতলের প্লাবন ভূমির তিন-সাড়ে তিন মিটার গভীর পানি ভাঙা অবস্থা থেকে কাশ্মীরের কয়েক হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ধান জন্মাতে পারে। শুধু জন্মাতে পারে বললেই নয়, সেসব এলাকায় অন্যতম ফসল হিসাবে ধানের ভূমিকা অন্যতম। এছাড়াও অন্যান্য বৈরী পরিবেশ যেমন_ লবণাক্ত, খরা, হড়কা বন্যাপ্রবণ এলাকায় দিব্যি টিকে থাকার মতো অনেক ধরনের ধানের জাতের কথা আমরা জানি। এ বৈচিত্র্য এশিয়াতেই বেশিরভাগ কেন্দ্রীভূত। আর আফ্রিকায় কিছু কিছু। মানুষের সভ্যতা আর ধান-আবাদের যাত্রা প্রায় একই সময় শুরু। তাই ধান নিয়ে মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না বুঝি। এ কারণেই বোধহয় ধানের এত বৈচিত্র্য। এটা আমার অনুমান। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিতে পারেন।

ধানের বিশটির মতো জংলি প্রজাতি আছে। আর দুটি মাত্র আবাদি প্রজাতি। একটি আফ্রিকায় অরাইযা গ্রাবেররিমা আরেকটি এশিয়ায় অরাইযা স্যাটাইভা। বিজ্ঞানীদের ধারণা আজকের দিনে সমুদ্রগর্ভে প্রায় বিলুপ্ত গন্ডোয়ানা ল্যান্ডে উদ্ভূত অভিন্ন উৎস থেকে প্রজাতি দুটোর জন্ম। সময়ের ধারাবাহিকতায় জংলি ধানের সাহচর্যে কখনও আপনা-আপনি কখনও বা মানুষের হস্তক্ষেপে আজ সারা পৃথিবীতে অসংখ্য ধানের জাত তৈরি হয়েছে। তবে কতসংখ্যক জাত উদ্ভূত হয়েছে তা এখন বলা মুশকিল। কারণ ইতোমধ্যেই অনেক জাত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে ধারণা করা হয় যে এ সংখ্যা ১৪০,০০০ কম নয়। সুখের কথা আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জিন ব্যাঙ্কে প্রায় ১২০,০০০ জাতের ধানের জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশ (বিহার এবং উড়িষ্যা ছাড়া) ধানের বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি ছিল। তবে ধানের আদি বৈচিত্র্যের ভা-ার বোধহয় উড়িষ্যায়ই বেশি। সাম্প্রতিক উড়িষ্যা সফরের সময় ওখানকার বিজ্ঞানী এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে আমার তাই মনে হয়েছে। তবে পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ভারতের 'সাতবোন প্রদেশগুলোর' অভিজ্ঞতা নিতে পারলে আমার ধারণা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা এখন বলতে পারছি না। যাহোক এক সময়ে আমাদের ঢাকায় কর্মরত প্রথম ধানবিজ্ঞানী জিপি হেক্টর বলেছিলেন এদেশে (অখ- বঙ্গ) প্রায় আঠার হাজার ধানের আবাদ হতো। তিনি একথা বলেছিলেন সম্ভবত ১৯১০ থেকে ২০ এর মধ্যে কোনো এক সময়ে। তিনি কতটা বিজ্ঞানভিত্তিক এ মন্তব্য করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে ১৯৮২ সালে ব্রি থেকে প্রকাশিত 'দেশি ধানের জাত' বই এ আজকের বাংলাদেশে আবাদি ধানের জাতের সংখ্যা দেয়া আছে ১২,৪৭৯। এখানে নেত্রকোনা এবং আর দুয়েকটি জেলার উপাত্ত ছাড়া পুরো বাংলাদেশের সবগুলো থানা থেকে সংগৃহীত ধানের জাতের নাম লিপিবদ্ধ করা আছে। কিছু কিছু নাম একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। তারপরেও বলা যায় এটি একটি অসাধারণ কাজ ছিল। এখন আবার এ ধরনের একটি সার্ভে হওয়ার দরকার। তাহলে জানা যাবে কি পরিমাণ দেশি জাত এখনও চাষিদের হাতে আছে। তবে পরিস্থিতি দেখে মনে হয় তাদের হাতে এখন খুব বেশি জাত নেই। এজন্য চাষিদের তথাকথিত স্বার্থ নিয়ে যারা কথা বলেন তারা সরাসরি আধুনিক প্রযুক্তিকে দায়ী করেন।

চাষিদের হাতে এখন যে বেশি দেশি জাত নেই; এটা কী ভালো হয়েছে নাকি খারাপ হয়েছে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। যারা চাষিদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলেন, মানববন্ধন করেন তারা বিষয়টি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। কিন্তু তারা এ কথা ভেবে দেখেন না যা পৌনে আট মিলিয়ন হেক্টর জমি থেকে ষোল কোটি মানুষের ডাল-ভাতের সংস্থান কোত্থেকে আসবে। কেউ কেউ আবার গতানুগতিক দেশি জাত দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে নানা জায়গায় বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে বেড়ান। যাহোক তারা যে জাতক্ষয়ের কথা বলছে সেটা পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ আমাদের জিন ব্যাঙ্কে সংগৃহীত পুরোপুরি দেশি জাতের সংখ্যা ৪,৬০০-এর উপরে। আরও নানা দেশের জাত ও উদ্ভাবিত কৌলিক

সারি দিয়ে এই সংগ্রহ এখন ৮,০০০-এর বেশি। দেশি জাতের সংগ্রহ কিন্তু একটি চলমান প্রক্রিয়া। আপাতত নজরে না পড়লেও এখনও আমাদের বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন জাতের সন্ধান পাচ্ছেন এবং আমাদের জিনব্যাঙ্কে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

দেশি ধানের জাত যে সংগ্রহ করে রাখতে হবে এবং জিন-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা তথা কথিত সংরক্ষণবাদিদের চেয়ে অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা অনুভব করেছিলেন। কারণ সবজাতই কোনো না কোনো অন্যন্য বৈশিষ্ট্যে অধিকারী। ১২,০০০ জাত আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি ঠিক। তবে উল্লেখ্যযোগ্যসংখ্যক জাত সংগ্রহ করা গেছে। এর অর্থ হলো অসংখ্য ভালো ভালো বৈশিষ্ট্য আমরা ধরে রাখতে পেরেছি। এবং এসব বৈশিষ্ট্য ধাপে ধাপে উচ্চ ফলনশীল জাতগুলোর মধ্যে সংযোজন করার চেষ্টা চলছে। একটি উদাহরণ যদি দেই। আমাদের দেশি আউশ ধানের মধ্যে বহু জাতই বেশি পরিমাণে জিঙ্কসমৃদ্ধ। এগুলো আউশের দেশি জাত তবে ফলন খুবই কম। প্রচুরসংখ্যক আউশের জাত বিশ্লেষণ করে জুতসই কিছু জাত নির্বাচন করা হয় এবং সেগুলো উচ্চ ফলনশীল কিছু কৌলিক সারি বা জাতের সঙ্গে সঙ্করীকরণ করে উচ্চ ফলনশীল জিঙ্ক ধান উদ্ভাবন করা হয়। একইভাবে হড়কা বন্যা বা সাবমারজেন্স টলারেন্ট ধানের জাত বের করা হয়েছে। একাজে একটি আউশ ধানের জাত মূল জাত হিসাবে নির্বাচন করা হয়। জাতটি উড়িষ্যা থেকে সংগৃহীত এবং পানির নিচে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগে এ গুণটি জানতে পারে। কয়েক বছর আগে মাত্র মলিকুলার জেনেটিঙ্-এর কল্যাণে এ জাতের মধ্যে সহনশীল বৈশিষ্ট্য সাব-১(ছঞখ ঝঁন ১) শনাক্ত করে তা প্রচলিত জনপ্রিয় জাতের মধ্যে সংযোজিত করা গেছে। চাষিরা রোপা আমন হিসাবে এ জাতগুলো এখন আবাদ করতে শুরু করেছে। এভাবে অজস্র ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

এখন কথা হলো যে, জাতগুলো হারিয়ে গেছে সেগুলো তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তবে যেগুলো রক্ষা করা গেছে সেগুলোকে কীভাবে তাদের অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে সংরক্ষণ করা যায়।

সাধারণত জাত সংরক্ষণের বেলায় দুই ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। প্রথমটি হলো 'এঙ্ -সিট' আর দ্বিতীয়টি 'ইন-সিটু' কনজারভেশন পদ্ধতি। এখনও পর্যন্ত এঙ্-সিটু পদ্ধতিই হলো প্রধানতম কৌশল। এ পদ্ধতিতে জিন ব্যাঙ্কে বীজ সংরক্ষণ করা হয়। বীজের অভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা কমিয়ে (৬% পর্যন্ত) নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। এ অবস্থায় বীজের সজীবতা বজায় থাকে অনেক বছর। আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ও জিনব্যাঙ্কের মানের উপর নির্ভর করে কয়েক পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত একটি জাত সংরক্ষণ করা সম্ভব। এ অবস্থায় সংরক্ষণ করা বীজের গুণাগুণ যেমন ভালো থাকে, সাথে সাথে বীজের কৌলিতাত্ত্বিক বৈেিশষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। ব্রির জিনব্যাঙ্কে অল্প সময় ও দীর্ঘ সময়ের জন্য দু'ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে। অল্প সময় অর্থাৎ ৪০ সে তাপমাত্রায় দশ বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। আর দীর্ঘ সময়ের জন্য (পঞ্চাশ বছর) হলে জিনব্যাঙ্কের তাপমাত্রার মাত্রা মেইনটেইন করা হয় মাইনাস ২০০ সে।

আগেই বলেছি ধানের যথেষ্ট জাতক্ষয় হয়ে গেছে এবং তাতে ক্ষতির মাত্রাও অপূরণীয়। তারপরও বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। নইলে তো বাকি জার্মপ্লাজমও হারিয়ে যেত। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) কথা বলতে হয়। ওখানকার বিজ্ঞানীরা ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনের উষালগ্ন (১৯৬০) থেকেই জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বোধহয় জানতো যে সময়ের সঙ্গে অধিকাংশ ধান উৎপাদনকারী চাষিরা দেশি ধানকে বর্জন করতে পারে। তাই এঙ্-সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রতি তারা বিশেষভাবে নজর দেয়। ফলশ্রুতিতে তারা জাতীয় পর্যায়ের বিজ্ঞানীদের নিয়ে ১৯৭৭, ১৯৮৩ এবং ১৯৯০-এ তিনটি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কসপ আয়োজন করে। ১৯৯৩ সালে সুইস উন্নয়ন করপোরেশন ধানের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত

করতে এগিয়ে আসে। এ কার্যক্রম শুধু ইরিতে নয় যে সব দেশের সঙ্গে ইরির গবেষণা সম্পর্ক আছে সেসব দেশে সম্প্রসারিত হয়।

বাংলাদেশের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের ইতিহাস আরও পুরনো। এখানে ধান গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রপাত ১৯১০-১১ সালে এবং তখন থেকেই জার্মপ্লাজম সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। সে সময় জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের জন্য আজকের মতো আধুনিকমানের জিনব্যাঙ্ক ছিল না। হয়তো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় অল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হতো। তাই প্রচুরসংখ্যক জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। তবুও সে সময়ের ধান বিজ্ঞানীরা যে বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল সেটাই বা কম কি। তবে তাদের সংগ্রহীত জার্মপ্লাজমের বেশকিছু জাত ভারত বিভাগের আগের সময়ে মার্কিন মুলুকে চলে যায়। ফলে জার্মপ্লাজমগুলো ভারতীয় জার্মপ্লাজম বলে সংরক্ষিত হয়। তার জ্বলন্ত উদাহরণ সিলেটের কাচালত জাতটি। এটিও আউশ ধানের জাত এবং ফসফরাস ইফিসিয়েন্ট জাত হিসাবে হাল আমলে আলোচনায় উঠে আসে। যাহোক আমাদের বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে পাকিস্তান আমলেও বেশ সচেতন ছিল কিন্তু পাকিস্তান সরকারের অবিমৃষ্যতার কারণে ঢাকার কৃষি গবেষণা খামারটি ভেঙে আইয়ুব নগরের (আজকের শেরে বাংলানগর) পত্তন করায় ধানের চার শতাধিক জামপ্লাজম হারিয়ে যায়। পরে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে (গাজীপুরে) ১৯৭০-এ যখন বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর নতুন করে ধান জার্মপ্লাজম সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। একসময় ইরি এসে এ কাজে হাত লাগায়। তবে পুরো প্রক্রিয়াটিই এঙ্-সিটু জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ কার্যক্রম মাথায় রেখে। অর্থাৎ জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করতে হবে তবে জিনব্যাঙ্কে।

এঙ্-সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতি বেশ উপযোগী। বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট জায়গায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এ কাজটি চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু পদ্ধতিটি নিয়ে কিছু কিছু সমালোচনা হচ্ছে। যেমন বীজটি তার প্রকৃত পরিবেশ থেকে অনেক দূরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় অনেকদিন ঘুমিয়ে থাকে। এ অবস্থায় বীজ বা জাতটি তার স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে যায়। পরে যখন বাইরে এনে জন্মানো হয় তখন বিদ্যমান কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে জাতটি পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে কি! হয়তো বা কিছুটা ব্যত্যয় ঘটে। এর কি কোনো বিকল্প আছে? বিজ্ঞানীরা বলছেন আছে। তা হলো সংগ্রহীত জার্মপ্লাজম প্রতিবছর মাঠে তার নিজস্ব পরিবেশে জন্মানো। যেটাকেই পোশাকি ভাষায় ইন-সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতি বলা হচ্ছে। কিন্তু হাজার হাজার জার্মপ্লাজম নিয়ে তার নিজস্ব পরিবেশে ফিরে গিয়ে প্রতিবছর চাষির জমিতে জন্মানো বিরাট ঝক্কি-ঝামেলার ব্যাপার। চাষি বোধহয় তাতে সায় দেবে না। তবে বিশেষ কিছু সুদৃশ ও সুস্বাদু জাতের বেলায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

যাহোক বিষয়টি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা বলা যেতে পারে। মোদ্দা কথা হলো, সব ফসলের জন্য জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ একটি জরুরি বিষয়। ধানের জন্য আমাদের দেশে ব্রি তা করছে। অন্যান্য ফসলের জন্য অন্য সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো করছে নিশ্চয়ই। আমি জোর দিয়ে বলছি এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা সচেতন।

আমাদের আপাত ধারণা জাতক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় এবং তা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কথাটি বোধহয় পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ আমাদের এখনও কয়েক হাজার জার্মপ্লাজমের সমৃদ্ধ সংগ্রহ আছে। এগুলোর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য যে লুকিয়ে নেই কে বলবে! আমি কিছুদিন আগে এপাতায় 'ষাট দিনে পাকে' এমন একটি জাতের কথা বলেছিলাম। আমাদের বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে বলেছিলাম। আমি নিশ্চিত কৌলিতাত্ত্বিক বিদ্যার আধুনিক প্রয়োগের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলো ফিরে পাওয়া সম্ভব। আমার বিশ্বাস আমাদের বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে ব্যাপক চিন্তাভাবনা করবেন। তাই তথাকথিত সংরক্ষণবাদীদের বলছি জাত হারিয়ে গেলেও হারিয়ে যাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একদিন ফিরে পেতে পারি।

[লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট]